৬৫ জকি শিশু মরুভূমির দুঃসহ দিনগুলো

দেশ থেকে শিশু পাচার হয়ে যায় মরুভূমির প্রান্তরে। আরবীয়দের ঐতিহ্য এবং মনোরঞ্জনে এসব শিশু কাজ করে উটের জকি হয়ে। উত্তপ্ত বালুর বুকে দুর্বিষহ জীবন কাটায় তারা। দালালের চক্রান্তে স্বজনহীন জীবন কাটে তাদের। দুঃস্বপ্নের দিনগুলোর অমানবিক জীবন থেকে মুক্তি পাচ্ছে তারা। বের হয়ে আসছে দালাল চক্রের বৃত্তান্ত। এসব নিয়ে... লিখেছেন মহিউদ্দিন নিলয়

'বিদেশ যাবি? চল তোরে নিয়া যাই। পড়ালেখা করামু, ঘোড়ায় চড়াইয়া ঘুরামু। কোনো অভাব থাকবো না। মাসে মাসে বাড়িতেও টাকা পাঠাবি।'

এরকম লোভ দেখিয়ে শিশু-কিশোরদের পাচার করে দেয় এদেশের একটি চক্র। সদ্য ফেরত আসা উটের জকি হিসেবে ব্যবহৃত কিশোরদের কাছে পাওয়া যায় এই তথ্য। তাদের সবার বক্তব্য প্রায় একই রকম। সবাইকে নানা রকম লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। চরম অভাবে থাকা শিশুগুলোর বাবা-মা ও পরিবার তাই লোভের পেছনে ছোটে। কেউ কেউ অবশ্য ছেলেধরাদের হাতে পড়ে বিক্রি হবার ঘটনাও রয়েছে। তবে অধিকাংশই অভাবী সংসারে বেড়ে ওঠা লোভের শিকার।

রাসেল আলীর বর্তমান বয়স ১৫ বছর। তার ছোট ভাই রিয়াজ হোসেনের ১৪। ৮ বছর আগে মায়ের হাত ধরে দুই ভাই ঘর থেকে বের হয়। এক দালাল যার নাম মনে করতে পারে না সে, তাদেরকে চাঁদপুর থেকে ঢাকার নিয়ে আসে। বিদেশে নিয়ে লেখা-পড়া করাবে এবং কাজ দিবে- এটা ছিলো দালালের প্রতিশ্রুতি। ঢাকায় এলে একটা জায়গায় কয়েকদিন রেখে দেয় তাদের। সেই জায়গার নাম আজ মনে করতে পারে না রাসেল। কারণ, তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ৭ বছর। ঢাকায় কিছুদিন থাকার পর ২/৩ জন এসে তাদের এয়ারপোর্ট নিয়ে যায়। বিমানে চড়ে চলে যায় দুবাই। দুবাই এয়ারপোর্টে দালাল আসে তাদের নিতে। দালালের বাসায় থাকে কয়েকদিন। এরপর দুই ভাইকে এক মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। তাদের মাকে পাঠিয়ে দেয় অন্যত্র। তাদের মালিক তাদেরকে উটের সঙ্গে থাকতে দেয়। শুরু করে উটের পিঠে চড়ার ট্রেনিং। উট থেকে পড়ে গেলে মারধর করতো। উটের পিঠে চড়ে ২ ঘন্টা দৌড়াতে হতো। এরকম করে দিনে ৩ বার সে উট নিয়ে বের হতো। এছাড়া নিয়মিত ঘাস, খেজুর, গম, দুধ, মধু ইত্যাদি খাওয়াতে হতো উটকে। উটকে নিয়ে অংশগ্রহণ করতো আরবের ঐতিহ্যবাহী খেলায়। উট দৌড়ের প্রতিযোগিতায় সে হতো উটের জকি। উটের পিঠে উঠে বেত নিয়ে তাড়াতো উটকে। প্রতিযোগিতায় জয়ী হলে মালিক খুশি হতো। মাসে মাসে ৩০০ দিরহাম পেতো বেতন। খাওয়া-দাওয়া তেমন ভালো দিতো না। দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর পর এখন দেশে ফিরে ভালো লাগছে তার। এখন সে পড়াশোনা করতে চায়।

আবদুল আজাদের পাসপোর্ট নাম আলম। তার বাবা লেদু মিয়ার নামের জায়গায় লেখা রয়েছে নূরনবী। এই নূরনবী তার মামার শালা। সম্পর্কে আত্মীয় এই মামা এবং মামী মিলে তাকে বিদেশের স্বপ্ন দেখায়। ঘোড়ার পিঠে করে ঘুরানো এবং লেখাপড়ার স্বপ্ন। নোয়াখালীর কোনো এক জায়গায় তার বাড়ি। গ্রামের নাম সে মনে করতে পারে না। নিজের বয়সটাও জানে না। মামা-মামীর কাছে শুনছে ৮ বছর বয়সে সে বিদেশ গেছে। নোয়াখালী থেকে কিভাবে কোথায় গেছে তার কিছুই মনে নাই। তবে মুম্বাই এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে উঠছে এটা মনে আছে। মুম্বাইতে সে কয়েকদিন ছিলো। তখন তার মামা-মামী তাকে তেমন খাওয়া-দাওয়া দিতো না। মুম্বাই থেকে বিমানে চড়ে যায় দুবাই। সেখান থেকে এক শেখের সঙ্গে তার উটের আস্তানায় জায়গা হয়। মামা-মামী তাকে শেখের কাছে বিক্রি করে দেয়। দুবাইয়ের রাসেকাইয়েমা নামক এক স্থানে থাকতো সে। উটের সঙ্গে ট্রেনিং নেয়। উট থেকে পড়ে গেলে গাছের সঙ্গে বেঁধে বেদম মার দিতো শেখ। গাড়ি নিয়ে তাড়া করতো। জোরে জোরে দৌড়াতে হতো মরুভূমির বালুর উপর দিয়ে। গাড়ির কাছাকাছি হয়ে গেলেই লাঠি দিয়ে মার দিতো। ১২/১৩ বছরের মতো সে কাটিয়ে এসেছে। প্রথম দিকে বেতন ছিলো ৩০০ দিরহাম, পরে হয় ৪০০। প্রথম ১০ বছরের টাকা তার মামা-মামী নিয়ে যায়। এরপর সে একদিন চুরি করে মামার বাসা থেকে নোয়াখালীর ফোন নাম্বার নেয়। ফোন করে ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয়। তারপর থেকে বাড়িতে টাকা পাঠাতো। ওজন কম রাখার জন্য

১৪ বছরের শিবলুর ওজন মাত্র ১৩ কেজি

খাওয়া-দাওয়া কম দিতো এবং মারধর করতো। শেষের দিকে সে ট্রেনার হয়ে যায়। নতুনদের ট্রেনিং দিতো। তার বেতন বেড়ে হয় ৬০০ দিরহাম। দেশে ফিরে এসেছে কিন্তু এখনও বাড়ি যেতে পারেনি। বাবা-মায়ের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সে।

বাবুল আর বাদল দুই ভাই। একজনের বয়স ১৪, অন্যজনের ১৩। ৬ বছর আগে খালার সঙ্গে দেশ ছেড়েছে। বাবা-মায়ের নাম এবং গ্রামের নাম কদমতলী ছাড়া আর কিছুই মনে নেই তাদের। কিভাবে কোনদিক দিয়ে গেলো কোনকিছুই মনে পড়ে না। তারা বেতনের সব টাকা খালাকে দিয়ে দিতো। উটের জকি হিসেবে কাজ করেছে তারা। বাবুল খুশির সঙ্গে জানায়, 'আমার উট অনেকবার ফার্স্ট হইছে। ফার্স্ট হইলে কফিল (মালিক) গাড়ি পাইতো, তলোয়ার পাইতো। আমারে ১০০ দিরহাম বখশিশ দিতো। মাঝে মাঝে খেলনাও কিনে দিতো'। তবু সে সেখানে ফিরে যেতে চায় না। দেশে থেকে অনেক বড় হতে চায় সে। আইনজীবী সমিতির ক্যাম্পে বসেই নাম লেখা শিখে গেছে।

সোহেল, মঈন, রুবেল, শিবলু এরকম আরো অনেক নাম রয়েছে যাদের সবার অবস্থা প্রায় একই রকম। এদের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে এসেছে বেশ কিছু তথ্য। ওজন কম রাখার জন্য তলপেটের দু'পাশে ড্রাগ পুশ করা হতো। বর্তমানেও শিবলু সেই ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি। চরম দুর্বলতার শিকার ১৪ বছরের এই ছেলেটির ওজন মাত্র ১৩ কেজি। জকিদের ওজন কম ধরে রাখার জন্য এই নজির। প্রতিযোগিতার নিয়ম হচ্ছে সর্বোচ্চ ২৫ কেজি থাকতে পারবে উটের পিঠে। আগে এই নিয়ম ছিলো সর্বোচ্চ ১৫ কেজি। তাই জকিদের ওজন কমিয়ে রাখতে সব ধরনের অমানবিক কাজ করতো তারা। শিশুদের স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি নষ্ট করে দিতো ড্রাগের মাধ্যমে। ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে দৌড়াতে হতো প্রত্যেককে।

যেভাবে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে

উটের জকি হিসেবে পাচার হয়ে যাওয়া শিশুদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়ার পর এ পর্যন্ত ৪টি ব্যাচে মোট ১৩২ জন দেশে ফিরেছে। ৭৩, ৭৮, ১২, ৯ এই ছিলো প্রতি ব্যাচের সদস্য সংখ্যা। এর মধ্যে উটের জকির সংখ্যা ৬৫ জন। এরা সবাই এখন আছে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির তত্ত্বাবধানে। ইউনিসেফের সহায়তায় সরকার উটের জকি হিসেবে ব্যবহৃত শিশুদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে। সেই উদ্যোগের বাস্তবায়ন চলছে একটি কমিটির মাধ্যমে। ইউনিসেফ, আইওএম, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মহিলা আইনজীবী সমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কমিটি করা হয়েছে। মানব শিশুর বদলে 'রোবট জকি' প্রচলনের উদ্যোগ নেয়ায় এ প্রক্রিয়াটি এখন অনেকটা সহজও হয়েছে। ইউনিসেফের একটি দল

বাবা-মায়ের কাছে ফেরার অপেক্ষায় ক্যারাম খেলে সময় কাটাচ্ছে জকি শিশুরা

সরাসরি কাজ করছে আমিরাতে। তারা ২২৩ জন বাংলাদেশী জকির একটা তালিকা তৈরি করেছে। সেই তালিকা অনুসারে চলছে প্রত্যাবর্তন। এ নিয়ে কথা হয় জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির অনুসন্ধানী কর্মকর্তা মমিনুল ইসলাম সুরুজের সঙ্গে। তিনি বলেন, আমরা মোটামুটি ৫০% শিশু শনাক্ত করতে পেরেছি। তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা জকিদের বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা অনুসন্ধান করে দেখছি। কারণ, প্রত্যাগত শিশুদের প্রায় অর্ধেক আছে নকল বাবা-মায়ের সঙ্গে। কোনো কোনো বাচ্চা হাট থেকে চুরি হয়েছে। আমরা পুনঃসংস্থানের বিষয়টি খুব গভীরভাবে ভাবছি। শিশুটি যাতে আবার কোনো ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে। স্থানীয় চেয়ারম্যান, মহিলা মেম্বার এবং টিএনও-এর দায়বদ্ধতার মাধ্যমে শিশুদের হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কমিটি প্রতিদিন আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।'

ফিরে আসা এসব শিশুদের অতিদ্রুত পুনঃসংস্থান করা খুবই জরুরি। তারা সবাই বাবা-মায়ের কাছে ফিরতে চায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খবর পেয়ে বাবা-মায়েরাও ছুটে আসছে ঢাকায়। আইনজীবী সমিতিতে গিয়ে ভিড় করছে। এসব শিশুদের পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী চক্রটি নিয়েও সরকারকে ভাবতে হবে।

এই শিশুটি দেশে ফিরে এসেছে কিন্তু জানে না মাতৃভাষা

প্রচারকারী চক্রের কার্যক্রম

শিশু পাচার এদেশের অপরাধ জগতের অনেক পুরনো ঘটনা। গ্রামে-গঞ্জে ছেলেধরা একটা আতঙ্কের মতো। কারা জড়িত এই শিশু পাচারের সঙ্গে? এসব বিষয় খুঁজে বের করে অপরাধীদের ধরতে হবে। একটা বিশাল নেটওয়ার্ক কাজ করে শিশু পাচার প্রক্রিয়ায়। কয়েকটি পর্যায়ে চলে এই কাজ। প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে কালেক্টর গ্রুপ। এরা বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে শিশুদের নিয়ে আসে। এরপর চলে যায় কেরিয়ার লেভেলে। সেখান থেকে ট্রানজিট লেভেল পার করে শিশুটি পাচার হয়। এর সঙ্গে জড়িত থাকে প্রশাসনের ভিতরে অনেক ব্যক্তি। দেশ থেকে সাধারণত চারটি পথে শিশু পাচার হয়। একটি চক্র সরাসরি জিয়া বিমানবন্দর থেকেই পাচার করে। উত্তরবঙ্গের সীমান্ত হয়ে জলপাইগুড়ি পার করে নেপালের কাঠমান্ডু বিমানবন্দর ব্যবহার করে একটি গ্রুপ। বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ব্যাঙ্গালোর বিমানবন্দর দিয়ে যায় একটি বিশাল অংশ। মাদ্রাজে এই চক্রের রয়েছে বিশাল নেটওয়ার্ক। ভারতের মুম্বাই হয়ে যায় একদল। এসব পাচার প্রক্রিয়া খুবই সহজ। কেননা, আমিরাতের যে কোনো বিমানবন্দরে নামলে ইমিগ্রেশন প্রথমে তাদের আটকে দেয়। পরে এজেন্ট বা শেখরা এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এতে কোনো ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয় না। এভাবে প্রতিনিয়ত পাচার হচ্ছে শিশুরা। এসব শিশু সেখানে গিয়ে প্রথমে শিক্ষানবিশ এবং পরে যথাক্রমে জকি, ট্রেনার ও সবশেষে নিজেরাই দালালে রূপান্তরিত হয়। এরাও জড়িয়ে পড়ে শিশু পাচারের সঙ্গে। আমিরাত থেকে ফেরত আসা বিভিন্ন জনের কেসস্টাডি অনুসন্ধান করে বেরিয়ে আসে শিশু পাচারের এসব তথ্য। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে পাচার হওয়া শিশুর সংখ্যা বেশি। এর বাইরে আছে সুদানের শিশু। ভারতীয় শিশু খুবই কম। একই ক্যাম্পে থেকেছে বিভিন্ন দেশের শিশু। প্রত্যাগত শিশুদের কেউ কেউ বাংলা বলতে পারে না, এমন কি বোঝেও না। আরবি ছাড়া উর্দু এবং হিন্দি জানে। এক সঙ্গে থাকার ফলে অনেকের ভাষা হয়ে গেছে মিশ্র উর্দু, আরবি, বাংলা।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটো**